২৪৬-A

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 06 JUL 1995
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ২

মুনতাসীর মামুন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের বিভিন্ন পদে নিয়োগ নিয়ে সমালোচনার শেষ নেই। সমালোচনা অবশ্যই হতে পারে, কিন্তু বিভিন্ন পদে নিয়োগ নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপও কম হচ্ছে না। এর একটি কারণ নিযুক্তির প্রক্রিয়া নিয়ে বিভ্রান্তি এবং উচ্চতর পদ যেমন, প্রফেসর বা এসোসিয়েট প্রফেসর পদে একই সঙ্গে অনেকের নিযুক্তি। প্রচলিত ধারণা, এ ধরনের পদে যেতে হলে বিপুল যোগ্যতা প্রয়োজন। যোগ্যতা অবশ্যই প্রয়োজন, কিন্তু অন্য একটি বিষয় সবার চোখ এড়িয়ে যায়, তা হলো বিভিন্ন বিভাগে পদের সংখ্যা। শুরুতে কোন কোন বিভাগে একটি বা দু'টি প্রফেসর ও রিডারের পদ ছিল। যিনি প্রফেসর হতেন তিনি না মারা গেলে বা অবসর না নিলে ঐ পদে কেউ যেতে পারতেন না। ফলে, মনে করা হতো ঐ পদে যেতে হলে বয়স ও বিপুল যোগ্যতা দরকার। কিন্তু, এ বিষয়টি ভাবা হয়নি বা হয় না যে, নিয়োগপ্রাপ্ত প্রফেসর থেকে যোগ্য হয়েও অনেকে প্রফেসর বা রীডার পদে উন্নীত হতে পারেন না শুধু মাত্র পদের কারণে এবং অন্তিম বিশ্লেষণে অন্যদের প্রতি অবিচারই করা হয়েছে। যেমন, ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, তার সময়ে, বাংলা বিভাগে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে যেসব প্রফেসর ছিলেন তিনি তাদের থেকে কম যোগ্য ছিলেন? ছিলেন না, কিন্তু প্রফেসর পদ পাননি। তবে, অবসর গ্রহণের পর এমেরিটাস প্রফেসর হয়েছিলেন।

বর্তমানে তুলনামূলকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে যে পদের সংখ্যা বেড়েছে তা নয়। তবে, যোগ্য শিক্ষকরা বিশেষ বিশেষ শর্ত পালন করলে, তাদের পদ উন্নাত করা হয়। এতে যোগ্য শিক্ষকদের ক্ষেত্রে অবিচার কম হয়। কিন্তু, এটাও ঠিক যে, এসব নিয়োগের ব্যাপারে নির্বাচন কমিটিকে প্রভাবান্বিত করা হয়, শৈথিল্য ও দলপ্রীতি দেখানো হয়। পদ পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত বিষয় ঐ কারণেই সমালোচিত। এর জন্য অবশ্যই আমরা দায়ী। কারণ, শিক্ষকরাই এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত।

অধ্যাপকের পদের সংখ্যা কতো সীমিত ছিল তার একটি উদাহরণ দিই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার যখন প্রস্তাব করা হয় তখন আরো অনেকের সঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যায়ের উপাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ও এর বিরোধিতা করেছিলেন। এ কারণে, বড়লাট হার্ডিঞ্জ তাকে একদিন ডেকে পাঠিয়ে সরাসরি জিজ্ঞেস করলেন, কিসের বদলে তিনি প্রতিবাদ করা থেকে বিরত থাকবেন? শুধু তাই নয়, বড়লাট আরো জানালেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হবেই। আশুতোষ বললেন, ''আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করব না যদি ভারত সরকার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে চারটি অধ্যাপক পদ সৃষ্টি করেন। বড়লাট তখনই এতে রাজি হলেন। বললেন, তাই হবে। তোমার সঙ্গে আমার এই যে কথাবার্তা হল এটি আমার দপ্তরে ঢাকা এ্যাক্ট বলে লেখা থাকবে।'' কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে চারটি অধ্যাপকের পদ পেয়েছিল সেগুলি হলো- কারমাইকেল- প্রফেসর অফ অ্যানসিয়েন্ট ইন্ডিয়ান হিস্টোরি অ্যান্ড কালচার, মিন্টো- প্রফেসর অফ ইকোনমিকস, জর্জ ফিফথ প্রফেসর অফ ফিলোসফি এবং হার্ডিঞ্জ- প্রফেসর অফ ম্যাথমেটিকস।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আদিতে প্রতিটি বিভাগে নিয়োগ খুবই যত্নের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করে দেয়া হতো। ঐ প্রক্রিয়ার ধরনই ছিল অন্যরকম। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর পদে নিয়োগ আসলে সে রকম যত্নের সঙ্গেই করা উচিত। তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক পরিবেশ উন্নত হয়। নিয়োগের সংকীর্ণ দ্বার (যা এখন আমরা দেখি) উন্মুক্ত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের আদি স্থপতিরা তাই চেয়েছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আদিতে বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষক হিসেবে যাদের নিয়োগ করা হয়েছিল তারা কি প্রক্রিয়ায় নিয়োগ পেয়েছিলেন এ প্রবন্ধ সে বিষয়েই। একটি প্রতিষ্ঠান কিভাবে গড়ে তুলতে হয় সে প্রক্রিয়া বোঝার জন্যই এ প্রবন্ধ। এ প্রবন্ধের ভিত্তি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য স্যার পি,জি হার্টগের ব্যক্তিগত কাগজপত্র। প্রাসঙ্গিক কিছু তথ্যের জন্য সাহায্য নেয়া হয়েছে অধ্যাপক আবদুর রহিমের 'হিস্ট্রি অফ ঢাকা ইউনিভার্সিটি (১৯৮১) এবং অধ্যাপক রমেশ চন্দ্র মজুমদারের, 'জীবনের স্মৃতি দীপে' (১৯৭৮) থেকে।

বঙ্গভঙ্গ রদের ক্ষতিপূরণ হিসেবেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। এ বিষয়ে সরকারি সিদ্ধান্ত হয় ২ ফেব্রুয়ারি ১৯১২ সালে। ২৩ মার্চ ১৯২০ সালে ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যাক্ট ১৯২০ পাস হয়। ১৯২১ সালের ১ জুলাই ৩টি ফ্যাকাল্টি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু। ফ্যাকাল্টি তিনটি ছিল-কলা, বিজ্ঞান ও মানবিক। বিভাগের সংখ্যা ছিল ১২। মোট শিক্ষক সংখ্যা ছিল সব মিলিয়ে ৬০ জন, তার মধ্যে কলা বিভাগে ছিলেন ২৮, বিজ্ঞানে ১৭ ও আইনে ১৫ জন। ছাত্র সংখ্যা ছিল ৮৭৭ জন (৩০ জন ডাবল এন্ট্রিসহ)।

পি,জি হার্টগ ছিলেন লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক রেজিস্ট্রার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আগে যে কমিটি করা হয়েছিল তিনি ছিলেন তার সদস্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য হিসেবে তাকে ১ ডিসেম্বর ১৯২০ সালে নিয়োগ করা হয়। একই বছর ১০ ডিসেম্বর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভার গ্রহণ করেন।

পূর্ববঙ্গের এই নতুন ও একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেয়ার জন্য হার্টগ যে খুব একটা ইচ্ছুক ছিলেন তা নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেয়ার ব্যাপারে মন স্থির করার আগে নিজের বেতন ভাতা নিয়ে সরকারের সঙ্গে দর কষাকষি করেছিলেন। সরকার অবশেষে তাকে মাসিক চার হাজার টাকা বেতন ও বিনা ভাড়ায় বাড়ি দিতে সম্মত হয়। সঙ্গে পাঁচ ভাগ কন্ট্রিবিউটারি রিটায়ারিং অ্যালাউন্স দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। হার্টগ নিয়োগ পেয়েছিলেন পাঁচ বছরের জন্য। পরে ১৯২৪ সালের ২৮ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নেয় উপাচার্য (হার্টগের পর) বেতন পাবেন মাসিক আড়াই হাজার টাকা। এছাড়া বিনাভাড়ায় বাড়ি। প্রভিডেন্ট ফান্ড ও ভ্রমণ ভাতার সুবিধাও পাবেন।

স্যার হার্টগ সম্পর্কে রমেশ চন্দ্র মজুমদার লিখেছেন- তিনি ''অতি যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। প্রথমাবধিই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য যথেষ্ট চিন্তা ও পরিশ্রম করতেন। তিনি যে সব নিয়ম-কানুন প্রবর্তন করেছিলেন পরবর্তীকালে তারই ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক রকম উন্নতি সম্ভবপর হয়েছিল। সাধারণত এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সব দোষত্রুটি দেখা যায় তার অনেকগুলি যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটেনি তার জন্য হার্টগের যথেষ্ট কৃতিত্ব আছে।'' হার্টগের আমলে পরীক্ষা সংক্রান্ত ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ে যে সব নিয়ম চালু করা হয়েছিল এখনও সেগুলি প্রায় অপরিবর্তিত অবস্থায় চালু আছে।

রমেশ চন্দ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনামের ভিত্তি নিয়ে একটি ঘটনার উল্লেখ করেছিলেন। ঢাকার আহসান মঞ্জিলের খাজা সাহাবুদ্দিন ইতিহাসে কয়েক নম্বরের জন্য অনার্স পাননি। ''তখন হিন্দু ও মুসলমান অনেক শিক্ষক এবং এমনকি বাইরের লোকও বলেছিলেন যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ব্যাপার অসম্ভব হত বাস্তবিকই পরীক্ষার বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খুবই সুনাম ছিল এবং আমার বিশ্বাস, এ বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে অনার্স এবং উচ্চমান স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এ দেশের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে তা বিরল। পরীক্ষায় সাফল্যের জন্য বা নম্বর বাড়ানোর জন্য কেউ কোনদিন দরবার করেছে- এ দৃষ্টান্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল।''

সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কতো গুরুত্ব দিতেন তার একটি উদাহরণ দিচ্ছি। সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন ঢাকার প্রথম নাগরিক। লাট-বেলাট কেউ ঢাকায় এসে লাঞ্চ বা ডিনার খেতে হলে উপাচার্যের সঙ্গেই তা খেতেন। বলাবাহুল্য এই ওয়ারেন্ট অফ প্রিসিডেন্সের জন্য কমিশনার, জজ প্রভৃতি আমলারা অসন্তুষ্ট ছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম আচার্য বা গভর্নর ছিলেন বাংলার গভর্নর রোনাল্ড শ'। তখনকার বাংলা, এখনকার বাংলাদেশের চেয়ে আয়তনে ছিল দ্বিগুণ। তা সত্ত্বেও দেখি, রোনাল্ড শ' বিশ্ববিদ্যালয়ের খুঁটিনাটি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন, বিভিন্ন নিয়োগের ব্যাপারে হার্টগকে চিঠি লিখছেন। সারা বাংলার প্রশাসনিক কার্য নিয়ে ব্যস্ত থাকার পরও, নতুন একটি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে গভর্নর কিভাবে এতো চিন্তা করতেন তাও ভাববার বিষয়। একবার একটি ক্যাম্প থেকে ফুলস্ক্যাপ কাগজের ১০ পাতা টাইপ করা চিঠি তিনি পাঠিয়েছিলেন হার্টগকে। এতে বোঝা যায়, চ্যান্সেলর নিজেও নতুন বিশ্ববিদ্যালয়টি সম্পর্কে উৎসাহিত হয়েছিলেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বৈশিষ্ট্যময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন।

হার্টগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেয়ার ব্যাপারে মন স্থির করার পরই গভর্নর ও লন্ডনে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেন। কাজে যোগ দেয়ার মাস পাঁচেক থেকেই এ প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়। হার্টগের প্রথম কাজটি ছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রতিশ্রুতিশীল ও যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ করা। এ কারণে, ভারত ও গ্রেটবৃটেনে তিনি খোঁজ করেছেন বর্ণ, সম্প্রদায়ের কথা না ভেবে। যাদের তিনি চেয়েছিলেন তাদের যে তিনি আনতে পেরেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে তা নয়। তবে বেশ কিছু বিভাগের জন্য তিনি চেষ্টা করেছিলেন। তার চিঠিপত্রগুলি এর প্রমাণ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার চাকরি আকর্ষণীয় করার উদ্দেশ্যে বেশ উঁচু হারে বেতন স্কেল দেয়া হয়। প্রফেসরদের বেতন স্কেল ছিল ১০০০-১৮০০ আর রিডারের ৬০০-১২০০। এ বেতন স্কেল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরদের বেতন স্কেল থেকেও বেশি ছিল। এ কারণে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনেকেই যোগ দিয়েছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। স্যার আশুতোষ এটি পছন্দ করেননি; তবে রমেশ চন্দ্রকে বলেছিলেন- ''দেখো, ঢাকায় অনেকেই দরখাস্ত করেছে এবং চাকরিও পাবে। আমি তাতে বাধা দিতে চাই না। কারণ, তোমরা যদি অনেকে ঢাকায় গিয়ে অধ্যাপনা করো, তাহলে আমি বলতে পারব যে Calcutta University is the Grandmother of Indian Universities.

১৯১৯ সালের আইন অনুযায়ী বাংলার প্রথম বাঙালি শিক্ষামন্ত্রী হলেন প্রভাস চন্দ্র মিত্র। তিনি প্রায় জেদ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন কমিয়ে দিলেন। প্রফেসরদের বেতন হার সর্বোচ্চ ১০০০ করা হলো। অন্যান্য পদের বেতনও হ্রাস পেল।

হার্টগের প্রথম কাজ ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর পদে শিক্ষক নিয়োগ এবং লন্ডনে বসেই তিনি এ প্রক্রিয়া শুরু করেন। লন্ডনের শিক্ষা দপ্তর, চ্যান্সেলর, নির্বাচকমণ্ডলীর বিভিন্নজনের সঙ্গে নিয়মিত চিঠিপত্র আদান-প্রদান শুরু হয়।

254-B

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 06 JUL 1995
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ২

১৯২০ সালের আগস্ট মাসে গভর্নর রোনাল্ড শ' হার্টগকে একটি দীর্ঘ চিঠি লিখেন। বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করে তিনি লেখেন–

" একটি বিষয়ে গোড়াতেই আমি গুরুত্ব দিতে চাই, তাহলো, প্রথম থেকেই এ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচলিত 'চাকরি ব্যবস্থা'র শর্তাবলী থাকবে না: শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিজনের সঙ্গে আলাদাভাবে বসে আলাপ–আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টির নিষ্পত্তি হবে। এবং এসব আলোচনার ভিত্তি হবে প্রার্থীর যোগ্যতা, বয়স, অভিজ্ঞতা, সবার ওপরে তার নিজ বিষয়ে বাজার দরও (মার্কেট ভ্যালু) যাচাই করতে হবে। মিঃ স্টেপলটনের বাজেটে ওভারসিজ অ্যালাউন্স নামে একটি বরাদ্দ আছে; বুঝতেই পারছেন আমি এর বিরোধী: আমি যে কোন স্টিরিওটাইপ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যেখানে জন্ম বা বর্ণের ভিত্তিতে বেতনের ক্ষেত্রে পার্থক্য করা হয় এবং এ বিষয়ে পরিষ্কারভাবে আমি আমার মতামত জানিয়ে দিয়েছি সেক্রেটারি অফ স্টেটকে।"

সে সময় ইউরোপীয় কর্মচারীরা সমমর্যাদার ভারতীয় চাকরিজীবীদের থেকে বাড়তি কিছু সুবিধা পেতেন। তার একটি ছিল গ্রীষ্মকালে পাহাড়ে অবস্থান ও কয়েক বছর পর পর 'হোমে' যাওয়ার জন্য সচেতন ছুটিসহ ভ্রমণ ভাতা। এ বৈষম্য ভারতীয়দের মনে স্বাভাবিকভাবেই হীনন্যতার সৃষ্টি করত। রোনাল্ড শ' তা চাননি। বিশেষ করে শিক্ষা ক্ষেত্রে। কারণ, হীনন্যতাবোধে আক্রান্ত শিক্ষক উচ্চ বিদ্যাপিঠে ছাত্রদের আত্মমর্যাদাবান করে তুলতে পারবে ন কিনা সন্দেহ।

রোনাল্ড শ' আরো লিখেছিলেন–

"আমার মনে হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থে প্রয়োজন হবে সরাসরি ইংল্যান্ড থেকে কিছু প্রফেসর ও রিডার নিয়োগ করা। তবে, আপনি ঠিকই বলেছেন, এ ক্ষেত্রে ভারতে সমযোগ্যতাসম্পন্ন কেউ আছেন কিনা তাও বিচার করতে হবে, যে কারণে সারা ভারতবর্ষে পদগুলি বিজ্ঞাপিত করার ব্যবস্থা করেছি।"

এরপর শিক্ষক নিয়োগের জন্য লন্ডনে কয়েকটি নির্বাচকমন্ডলী করা হয়। এবং নির্বাচকমন্ডলীর সদস্য কারা হবেন এ বিষয়েও লন্ডনের শিক্ষা বিভাগ, হার্টগের মধ্যে বিস্তর চিঠিপত্র চালাচালি হয়েছে।

হার্টগের খুব ইচ্ছে ছিল ফনেটিকস বা ভাষাতত্ত্বের জন্য একজন অধ্যাপক নিয়োগ করার। এ পদের জন্য তিনি ভেবেছিলেন তৎকালীন বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ ড্যানিয়েল জোনসকে। ১৯২০ সালের গোড়া থেকেই এ ব্যাপারে তিনি লন্ডনের বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেন। ড্যানিয়েল জোনসকেও চিঠি লিখেন. জোনস জানালেন, বেতন হিসেবে বছরে বারো হাজার টাকা তার কাছে যথেষ্ট নয় বলেই মনে হচ্ছে। "বছরে এর সঙ্গে কি ভাতা হিসেবে আরো ছয় হাজার টাকা যোগ করা যাবে?" জোনস জানিয়েছিলেন, তিনি যদি নিজে ঢাকা যেতে না পারেন তাহলে লন্ডনে আরো কজন ভালো ভাষাতত্ত্ববিদ আছেন। তাদের খোঁজ–খবর তিনি দিতে পারেন। "এদের দু'জনকে আমি চিনি", লিখেছেন জোনস, "কিন্তু, তারা বোধহয় যেতে রাজি হবেন না. এছাড়া প্রয়োজনীয় যোগ্যতা আছে, এমন আরেকজন প্রার্থী হতে পারেন তিনি হলেন জি, নোয়েল আর্ম ফিল্ড।" হার্টগ জোনসকে লিখেছিলেন– "I think the task of putting the teaching of phonetics on a proper basis in india would be a great one."

গভর্নরের সঙ্গে চিঠিপত্র আদান–প্রদানের সময়ও হার্টগ ভাষাতত্ত্বের ব্যাপারে জানিয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, জোনস হয়ত ঢাকা আসতে পারেন তবে তার বেতন হতে হবে ১৮০০০ থেকে ২১,৬০০ টাকা। তবে, ফনেটিক লাইব্রেরির জন্য তিনশ' ও ফনেটিক টাইপরাইটিংয়ের জন্য আরো দু'শ' পাউন্ড বাড়তি লাগবে। তা'ছাড়া, ঢাকা জেলার ভাষাতাত্ত্বিক জরিপের সুযোগও দিতে হবে। "জোনস শুধুমাত্র একজন পথিকৃৎ–ই নন", লিখেছেন হার্টগ, "তিনি বড় মাপের একজন শিক্ষকও বটে যার সাফল্য প্রচুর। বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য তাকে আনা গেলে বড় ধরনের লাভ হবে; ভারতের নানা প্রান্ত থেকে তিনি বিভিন্ন ব্যক্তিকে আকর্ষণ করতে পারবেন। তিনি শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেবেন, যারা আবার "Transform the pronunciation of English in the schools." জোনস সেপ্টেম্বরে জানালেন, তার পক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদ গ্রহণ করা সম্ভব নয়। কারণ, তার চিকিৎসকের বারণ। পরে, দেখা যায় এ পদের জন্য প্রার্থী হয়েছিলেন নোয়েল আর্মফিল্ড। কিন্তু, নির্বাচনী বোর্ড তাকে মনোনীত করেনি। অক্টোবরে হার্টগের লেখা এক চিঠিতে জানা যায়, ডঃ ই, এম, এডোয়ার্ডসকে এ পদে নিয়োগ করা যায় কিনা সে চিন্তা করছিলেন. কিন্তু, পরে দেখা যাচ্ছে, ভাষাতত্ত্ববিদ হিসেবে কাউকে নিয়োগ করা হয়নি।

রোনাল্ড শ' বিভিন্ন বিভাগীয় পদে নিয়োগের জন্য কয়েকজনের নাম প্রস্তাব করেছিলেন। ইংরেজির প্রফেসর পদের জন্য তিনি প্রস্তাব করেছিলেন ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ এফ, সি টার্নারের নাম। আরবির প্রফেসর হিসেবে ডঃ জিয়াউদ্দিন ও ডঃ সিদ্দিকির নাম। এছাড়া আই, ই, এস ক্যাডার থেকে দর্শনের প্রফেসরের পদের জন্য জর্জ হ্যারি ল্যাংলি, ইংরেজির জন্য ইগারটন স্মিথ ও অংকের জন্য বি এম সেনের নাম বিবেচনার অনুরোধ জানিয়েছিলেন।

প্রফেসর ল্যাংলি ছিলেন তখন ঢাকা কলেজে। বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ পদে তাকে নিযুক্ত করা হয়। পরবর্তীকালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় উপাচার্য হিসেবে ১৯২৬ সালে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ঐ পদে ছিলেন তিনি ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত।

প্রফেসর বি, এম সেনগুপ্তও ছিলেন ঢাকা কলেজে এবং অংকবিদ হিসেবে তা'র খ্যাতিও ছিল। অংক বিভাগের প্রধান ও প্রফেসর হিসেবে তাকেও নিয়োগ করা হয়। তবে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত ছিলেন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। তারপর প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষর ভার গ্রহণের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে চলে যান।

ইগারটন স্মিথ ও টার্নারের ক্ষেত্রে গভর্নরের অনুরোধ রক্ষা করা যায়নি। টার্নারের ব্যাপারে হার্টগ গভর্নরকে জানিয়েছিলেন, টার্নার নিজেও এ পদে যোগ দিতে চাইবেন কিনা সন্দেহ। "কাগজপত্রে তার যা যোগ্যতা দেখা যাচ্ছে তা সামান্য। দু'বছর ধরে তিনি বিষয়টি পড়াচ্ছেন অথচ এ বিষয়ে তার কোন লেখাজোখা নেই। তার এমন কোন একাডেমিক কৃতিত্বও নেই যে কারণে রিডার হিসেবেও তার নিযুক্তির যৌক্তিকতা দেখানো যেতে পারে।" হার্টগ আরো লিখেছেন, টার্নার তাকে জানিয়েছেন লেকচারশিপ ও সঙ্গে একটি প্রভোস্টশিপ বা টেজারার পদ দিলেই তিনি সন্তুষ্ট, তবে বেতন হতে হবে ১৯০০ টাকা। ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে টার্নার তখন হয়ত এই বেতনই পেতেন। কিন্তু, হার্টগ তাতেও রাজি ছিলেন না। তার মতে, মাসে ১৯০০ টাকা বেতন একটু বেশি। কারণ, একজন প্রভোস্টের একাডেমিক কাজ থেকে প্রশাসনিক কাজ বেশি! টার্নার পরে ঢাকা হলের প্রভোস্ট ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্রন্থাগারিক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

সঙ্গে ইংরেজির অনারারি লেকচারশিপ:

হার্টগ গভর্নরকে জানিয়েছিলেন, ললিত মোহন চট্টোপাধ্যায়ের কথা তিনি লেখেননি। তার 'কেস'টিও টার্নারের মতো। "মনে হয়, ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে তিনি কিছু কাজও করেছেন যে কারণে ইংরেজির রিডারের পদটি তাকে দেয়া হয়ত যুক্তিযুক্ত। আর তার পূর্বেকার অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে বলতে হয়, (তা' হলে) স্বাভাবিকভাবেই তিনি হবেন জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষ।" কিন্তু, ললিত মোহনকে নিয়োগ করা হয়নি।

রোনাল্ড শ' হার্টগকে শিক্ষা বিভাগের জন্য এম, পি ওয়েস্টের নাম প্রস্তাব করেছিলেন। তিনি ছিলেন টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ। এ পরিপ্রেক্ষিতে হার্টগ রোনাল্ড 'শ'কে জানিয়েছেন, নির্বাচক কমিটি মিঃ ওয়েস্টকে প্রফেসর পদের জন্য উপযুক্ত মনে করছেন না। শুধু তাই নয় তাকে রিডারশিপ দেওয়া যাবে কিনা সে বিষয়েও মতদ্বৈধতা ছিল। "আমি অবশ্য নিজে", লিখেছেন হার্টগ, "তাকে রিডারশিপ দেয়ার জন্য প্রস্তুত, তবে "একজন স্ট্রং চিফের অধীনে। আমি মনে করি, কিছু ত্রুটি–বিচ্যুতি সত্ত্বেও তার প্রশংসনীয় অনেক গুণ আছে।"

ইতোমধ্যে দেশ–বিদেশে বিজ্ঞাপনের পরিপ্রেক্ষিতে অনেকে আবেদন করেছিলেন। এবং যাদের যোগ্য বিবেচনা করা হয়নি তাদের জানিয়ে দিতে বলা হয়েছিলো। এঁদের মধ্যে ছিলেন ফনেটিকসে নোয়েল আর্মফিল্ড, ইংরেজিতে মিঃ পিংক ও ইতিহাসে মিঃ হালিম। আবদুল হালিম পরে অবশ্য ইতিহাস বিভাগে যোগ দিয়েছিলেন লেকচারার হিসেবে।

৫ অক্টোবর লন্ডনের বোর্ড অফ এডুকেশন–এর পরিচালক টুয়েন্টিম্যান হার্টগকে জানালেন যে, পদার্থবিদ্যা বিভাগের তিনজন প্রার্থী– মল্লিক, সাহা ও মসকে ডাকা হচ্ছে। এক সপ্তাহ পর গভর্নরকে হার্টগ বিভিন্ন বিভাগের নিয়োগের একটি সারমর্ম পাঠান। তিনি জানান, রাষ্ট্র বিজ্ঞান ছাড়া বাকি বিভাগগুলির উচ্চতর পদসমূহ সম্পর্কে মোটামুটি সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে চেয়ারম্যান ও রিডারশিপের জন্য উপযুক্ত কাউকে পাওয়া যায়নি। ইতিহাস ও পলিটিকাল ইকোনমির ক্ষেত্রেও একই অবস্থা।

রসায়ন বিভাগের জন্য ডঃ জ্ঞান চন্দ্র ঘোষ নামে একজন 'রিমার্কেবল ইয়ং ইন্ডিয়ান'কে পাওয়া গেছে যার গবেষণা ইতোমধ্যে দেশে–বিদেশে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কিন্তু, হার্টগ জানালেন, তার বয়স মাত্র ২৮। বিশেষজ্ঞরা দৃঢ়ভাবে জানিয়েছেন এবং নির্বাচকমন্ডলীও একমত যে, সম্ভব হলে অর্গানিক কেমেস্ট্রির 'চেয়ার' ও পরিচালনার ভার দেওয়া উচিত ঢাকা কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ও বর্তমানে (অর্থাৎ ১৯২০ সালে) কানপুরে কর্মরত ই, আর ওয়াটসনকে। এবং ঘোষকে 'ফিজিক্যাল কেমেস্ট্রি'র প্রফেসর পদ দেওয়া উচিত। এটি হবে একটি "Admirable Combination". তারপর ভারতবর্ষ থেকে ইনঅর্গানিক কেমেস্ট্রির জন্য একজন রিডার খুঁজে বের করতে হবে।

পরে অবশ্য জ্ঞান চন্দ্র ঘোষকেই কেমেস্ট্রির প্রফেসর ও চেয়ারম্যানশিপ দেওয়া হয়। ডঃ ঘোষ ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঋণ শোধ না করে তাঁর পক্ষে ঢাকায় যোগ দেওয়া সম্ভব ছিল না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তার ক্যাপিটাল গ্রান্ট থেকে এ ঋণ শোধ করে দিয়েছিল টাকার পরিমাণ ছিল ১০,৭০০ টাকা। এ পরিপ্রেক্ষিতে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল ১৩ ডিসেম্বর ১৯২১ সালে ৩৬নং প্রস্তাব নিয়েছিল এভাবে–

"That Rs. 10,700 be paid to Dr. J. C. Ghosh to pay of his debt to the calcutta University and that the sum be debited to the annual capital expenditure of the University provided that Dr. Ghosh gives an undertaking that he will remain in Service of the University for a period of five years. and his scale of salary remain unaffected."

পদার্থ বিদ্যার ক্ষেত্রে জানিয়েছেন হার্টগ, আরেকজন ভারতীয়–ই শ্রেষ্ঠ। তার নাম মেঘনাদ সাহা; যিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন লেকচারার এবং তখন ছিলেন লন্ডনে। হার্টগ, ডঃ সাহাকে উল্লেখ করেছেন– "Man of great ability" হিসেবে। কিন্তু বিভাগ প্রধানের দায়িত্ব তিনি পালন করতে পারবেন কিনা সে বিষয়ে তার সন্দেহ ছিল, কারণ ডঃ সাহার বয়স খুবই কম. এ পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা কলেজের অধ্যাপক ডব্লিউ, এ জেনকিনসের কথা তারা ভাবছিলেন

পদার্থ বিদ্যা বিভাগের নিয়োগ নিয়ে হার্টগ আসলে মন স্থির করতে পারছিলেন না। ১৯ অক্টোবর স্যার অলরি স্যুষ্টার এফ, আর, এস কে জানালেন, কেমব্রিজে রাদারফোর্ডকে তিনি লিখেছেন, কয়েকজনের নাম প্রস্তাব করতে। ডঃ সাহাকে হার্টগের বেশ পছন্দ হয়েছিল। স্যুষ্টার ও রাদারফোর্ডকেও তিনি তা জানিয়েছিলেন। স্যুষ্টারকে লিখেছিলেন–

"The most promising candidate was saha but we were all of opinion that in spite of brilliant abilities be had not the experience necessary to take charge of a Department."

হার্টগের চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে রাদারফোর্ড গ্লাসনের নাম প্রস্তাব করেন। ১০ নভেম্বর হার্টগ রাদারফোর্ডকে জানালেন, গ্লাসনের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে এবং নির্বাচকমন্ডলী তাকে পছন্দও করেছে। কিন্তু বিচার করতে হবে, এক্ষেত্রে জেনকিন্স থেকে তিনি যোগ্যতর কিনা। জেনকিন্স শেফিল্ডে ছিলেন এবং রিসার্চ স্কলারশিপ নিয়ে ক্যাভেনডিশ ল্যাবরোটরিতেও ছিলেন: তা সত্ত্বেও, হার্টগ জানিয়েছিলেন, এ পরিস্থিতিতে গ্লাসনকেই শক্তিশালী মনে হচ্ছে। তবে, গ্লাসন বা সাহা নন, শেষ পর্যন্ত জেনকিন্সকেই পদার্থ বিদ্যা বিভাগের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল।

অংকের রিডারশিপের জন্য গভর্নরকে জানিয়েছিলেন হার্টগ, দু'জন খুব ভালো প্রার্থী পাওয়া গেছে এবং দু'জনেই ভারতীয়। তবে, দু'জনের মধ্যে সেরা হচ্ছে মিঃ সবুর যিনি কেমব্রিজে স্মিথ প্রাইজ পেয়েছেন। এবং নির্বাচকমন্ডলী একমত যে, এক্ষেত্রে ইংরেজ কোন প্রার্থী পাওয়া যাবে না। পরে, অবশ্য বি, এস সেনগুপ্তকেই অংকের দায়িত্ব দেয়া হয়।

289-C

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 06 JUL 1995
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৯

শিক্ষা বিভাগের প্রফেসরের জন্য উপযুক্ত প্রার্থী পাওয়া যায়নি। রিডারশিপের জন্য মাইকেল ওয়েস্টের নাম প্রস্তাব করা হয়েছিল কিন্তু লন্ডনের বোর্ড অফ এডুকেশন তাতে রাজি হয়নি। পরে অবশ্য মাইকেল ওয়েস্টকেই নিয়োগ করা হয়েছিল।

ইতিহাস বিভাগের জন্য তখনও উপযুক্ত কাউকে পাওয়া যায়নি। হার্টগের ইচ্ছে ছিল আলিগড় থেকে এফ, রহমানকে আনা কিন্তু রিডার হওয়ার মত উপযুক্ত যোগ্যতা তার ছিল না। হার্টগ শিক্ষা বিভাগের পরিচালক হর্নেলকে লিখেছিলেন, ইতিহাস বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান পদের প্রার্থী হিসেবে রহমানের দরখাস্ত তিনি দেখেছেন এবং ব্যক্তিগতভাবে তাকে নিতে তিনি বড়ই ইচ্ছুক। কিন্তু এ পদে রহমানের নিযুক্ত তিনি ডিফেন্ড করতে পারবেন না কারণ রহমানের কোন প্রকাশনা নেই। তবে, হার্টগ যেহেতু চেয়েছিলেন সেহেতু তিনি পথও বের করেছিলেন। এফ, রহমানকে এস, এম হলের প্রভোস্ট ও ইতিহাস বিভাগের রিডার হিসেবে নিয়োগ করা হয়। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ জিয়াউদ্দিনকে হার্টগ লিখেছিলেন, রহমান যেন এ আমন্ত্রণ গ্রহণ করে, কারণ "I think the post had great opportunities for him and for Dacca". হার্টগের ভবিষ্যতবাণী মিথ্যা হয়নি। এ, এফ রহমান ১৯৩৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হন এবং সে পদে তিনি ছিলেন ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত। তিনি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় উপাচার্য।

আদি নিয়োগের ক্ষেত্রে দেখা যায়, শিক্ষকদের যোগ্যতার একটি মাপকাঠি ছিল নিজ বিষয়ে দক্ষতা, অভিজ্ঞতা এবং গবেষণা। ঐ সময় বিভিন্ন পদে নিয়োগের ব্যাপারে সাম্প্রদায়িক প্রশ্নও উঠতো। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্টের মুসলমান সভ্যরা চাইতেন মুসলমান প্রার্থী যদি তুলনামূলকভাবে কম যোগ্যও হয় তবুও যেন পদটি তারই হয়। রমেশ চন্দ্র মজুমদার এ বিষয়ে তাদের সঙ্গে আলাপ করেন। তিনি বলেছিলেন, "বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা দানের উৎকর্ষ নির্ভর করে তার শিক্ষকমন্ডলীর ওপরে। এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রধানতঃ মুসলমান ছাত্রদের কল্যাণের জন্যই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং যোগ্য শিক্ষক যদি নিযুক্ত না হয় তাহলে মুসলমান ছাত্রদের পক্ষেই তা পরিণামে অনিষ্টের কারণ হবে। এর উত্তরে তারা যা বলতেন সেটিও খুবই বিচার বিবেচনা করে দেখার মতো। তাদের মতে প্রধান প্রধান অধ্যাপক (Professor, reader) নিয়োগের বেলায় সাম্প্রদায়িক কোন প্রশ্নই তোলা উচিত নয়। গুণানুসারে যাতে যোগ্যতম ব্যক্তিই নিযুক্ত হন তা তারা সম্পূর্ণ অনুমোদন করেন। কিন্তু অন্যান্য শিক্ষক এবং কর্মচারীদের বেলায় কতকাংশে নিকৃষ্ট হলেও তারা একমাত্র মুসলমানকেই নিযুক্ত করতে চান।

তার কারণ এই যে, বাংলাদেশে, বিশেষত পূর্ববঙ্গে, মুসলমানদের অবনতির একটি প্রধান কারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের অভাব। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী সৃষ্টি করতে হলে শিক্ষক দিয়েই তা আরম্ভ করতে হবে।"

বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত এ যুক্তি অসার মনে হলেও মূল বিষয়টি কিন্তু যুক্তিযুক্ত। অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎকর্ষ নির্ভর করে শিক্ষকদের ওপর এবং প্রধান প্রধান পদে গুণানুসারে যোগ্যতম ব্যক্তিকেই নিয়োগ প্রদান বাঞ্ছনীয়। এখানে বর্ণ ভাষা, ধর্ম, দল, গোষ্ঠী যাতে কোন বাধা না হয়ে দাঁড়ায়। আদি প্রতিষ্ঠাতারা এটি মনে রেখেছিলেন যে কারণে অচিরেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম ছড়িয়ে পড়েছিল যা এখনও আমরা ভোগ করছি। উত্তরসূরিদের জন্য, এবং যেহেতু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় সম্পূর্ণভাবে সমাজের টাকায় চলে, সেহেতু উচ্চতর পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে যেসব রূঢ় সমালোচনা হচ্ছে সেগুলি দেশের, আমাদের সবার স্বার্থে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিবেচনা করে দেখা উচিত।